মাদকাসক্তির সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা

ইকবাল মাসুদ

বিশ্বজুড়ে মাদকাসক্তি একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধবিষয়ক অফিস ইউএনওডিসির তথ্যানুসারে ২০১১ সালে বিশ্বে ১৬ থেকে ৩১ কোটি মানুষ অন্তত একবার অবৈধ মাদক গ্রহণ করেছে। আর এ সংখ্যা বাংলাদেশে অনুমান করা হয় ৫০ লাখ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, মাদক সরাসরি একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। মাদকের অপব্যবহার বর্তমানে বাংলাদেশে একটি ক্রমবর্ধমান জাতীয় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। আজকাল মাদকদ্রব্য নানা ধরনের হয়েছে এবং অভ্যাসও অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এমন কোনো বয়স নেই যাদের মধ্যে মাদকাসক্তি দেখা যায় না। ছাত্র, শ্রমজীবী, পেশাজীবী, গাড়িচালক এমনকি রিকশাচালকদের মধ্যেও নেশা করার প্রবণতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এদেশের লাখ লাখ মানুষ মাদক ব্যবহারকারী এবং তাদের অধিকাংশই ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে।

একসময় বাংলাদেশকে মাদক পাচারকারীরা করিডোর হিসেবে ব্যবহার করলেও বাংলাদেশ এখন একটি বড় বাজারে পরিণত হয়েছে। আজকাল বাংলাদেশের কিছু কিছু মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হেরোইন ১৯৮১-৮২ সালের দিকে বাংলাদেশে প্রথম দেখা যায়। তখন ছিল অতি অল্প। ক্রমান্বয়ে তা অনেক বৃদ্ধি পায়। পেথেডিন যা বেদনানাশক বলে চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতো, যা একশ্রেণীর মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি অপব্যবহার করছে এবং এর অবৈধ ব্যবহার অনেকগুণ বেড়ে গেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মেথামফিটামিন অর্থাৎ ইয়াবার ব্যবহার অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলেছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর ২০০৯ সালে ১ লাখ ২৯ হাজার ৬৪৪ ইয়াবা আটক করে, আর ২০১২ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯ লাখ ৫১ হাজার ৩৯২টিতে। এ পরিসংখ্যানই বলে দেয়, ইয়াবার চাহিদা দেশে কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইয়াবা সেবনে সাময়িকভাবে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলেও এর নেশার প্রভাব শেষ হওয়ার পরে ব্যবহারকারী চরম শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, হতাশা, নৈরাশ্য ও বিষাদে পতিত হয়। ক্রমাগত ইয়াবা ব্যবহারে স্মৃতিভ্রষ্টতা ও মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিতে পারে।

বিভিন্ন তথ্য অনুসারে জানা যায়, বাংলাদেশে প্রায় ৫০ লাখ মাদক ব্যবহারকারী রয়েছে। আইএনসিবির একই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে ২০১০ সালে আনুমানিক ২ হাজার ৫০০ মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ যা ৫০ লাখ মাদকাসক্তের মধ্যে মাত্র শতকরা ০.০৫ ভাগ।

মাদকাসক্তিকে একটি অসুস্থতা, আসক্ত ব্যক্তির নিজ জীবনকেই শুধু ধ্বংস করে না– তার পরিবার, প্রতিবেশী, পারিপার্শ্বিকতাও এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্রমাগত মাদক গ্রহণের ফলে তার শরীরের ওজন কমতে থাকে। অনিদ্রা, অনাহার, অনিয়ম, অযত্ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শরীর শুকিয়ে যায়। এছাড়া দীর্ঘদিন মাদক ব্যবহারের ফলে নির্ভরশীল ব্যক্তির রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস, স্নায়ুর বিভিন্ন রোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, ব্রঙ্কাইটিস, অন্ত্রে ঘা, যৌন অপারগতা, সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতা, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করলে এইডস, হেপাটাইটিস-এ ও বি'সহ বিভিন্ন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অপরদিকে মাদকের সঙ্গে এইচআইভির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশে শিরায় মাদক গ্রহণকারীর সংখ্যা ২০ থেকে ২৫ হাজার। এদের মধ্যে একটি বিশেষ এলাকায় এইচআইভি সংক্রমণের হার ৫.২৫ ভাগ, যা ঘনীভূত মহামারী বা Concentrated Epidemic বলা হয়ে থাকে।

একজন ব্যক্তি পারিবারিক কলহ, বন্ধুদের চাপ, হতাশা, মানসিক যন্ত্রণা, কষ্ট– যে কারণেই মাদক গ্রহণ করে থাকুক না কেন, দীর্ঘদিন মাদক নির্ভরশীলতার পর তাকে নিয়ে পরিবার অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক নির্যাতনসহ নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হন, এমনকি শারীরিক নির্যাতনেরও নজির আছে অনেক। অনেক চেষ্টার পরও তাদের মাদকমুক্ত রাখতে না পেরে তার প্রতি প্রচণ্ড রাগ, ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতা তৈরি হয়। চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে যোগাযোগ করা হলেও পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসার সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চায়। তাই বলা হয়, মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি শুধু একা নয় তার পুরো পরিবারই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

মাদক নির্ভরশীলতাকে বলা হয় একটি জটিল পুনঃআসক্তিমূলক মস্তিষ্কের রোগ বা এ ক্রনিক রিল্যাপ্সিং ব্রেইন ডিজিজ, যা বারবার হতে পারে অর্থাৎ একজন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণের পরও আবার মাদক গ্রহণ শুরু করতে পারে। মাদক গ্রহণজনিত রোগকে তাই ডায়াবেটিস বা হৃদরোগের সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ যে ব্যক্তির একবার ডায়াবেটিস বা হৃদরোগ হয় তার সারা জীবন কিছু বিধিনিষেধ বা ব্যবস্থাপনার মধ্যে থাকতে হয়। ঠিক তেমনি মাদক নির্ভরশীলতার চিকিৎসার পরও রোগীকে কিছু বিধিনিষেধ বা ব্যবস্থাপনার মধ্যে থাকতে হয়। এর ব্যত্যয় ঘটলে রোগী আবার মাদক গ্রহণ শুরু করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু ওষুধনির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা মাদক নির্ভরশীলদের মাদকমুক্ত রাখতে সামান্য ভূমিকা রাখে।

একজন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিকে মাদকমুক্ত করতে প্রয়োজন সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা। কারণ একজন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক ও পারিবারিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দীর্ঘদিন মাদক গ্রহণের কারণে অনেকেরই আচরণ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে থাকে বিধায় তাকে মাদকমুক্ত থাকতে হলে আচরণ ও চিন্তাচেতনার পরিবর্তন প্রয়োজন। আচরণ পরিবর্তন একটি কষ্টসাধ্য বিষয় হলেও মাদকমুক্ত থাকার সঙ্গে আচরণ পরিবর্তন গভীরভাবে জড়িত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এজন্য দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোর চিন্তা ও আচরণ পরিবর্তনকে গুরুত্বের সঙ্গে মাদক চিকিৎসায় সম্পৃক্ত করেছে। এজন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, একজন নির্ভরশীল ব্যক্তির দৈহিক চিকিৎসার পাশাপাশি আচরণ পরিবর্তন, নৈতিক গুণাবলি শিক্ষা প্রদান এবং এমনভাবে সুস্থ করে তোলা যাতে সে জীবনের সাধারণ সমস্যার মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এছাড়া রোগী জীবনের ভুলত্রুটিগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও ব্যক্তিগত মানসিক উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কাউন্সিলরের অধীনে কাউন্সিলিং গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবারকে সম্পৃক্ত করে, পরিবারের মধ্যে রোগীর সুস্থ হওয়ার মতো ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। কারণ পরিবারই রোগীর স্থায়ী ঠিকানা, সেখানে তাকে যথাযথ পরিচর্যা না করলে রোগী সুস্থ থাকার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। বাংলাদেশের প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও সম্পূর্ণ ওষুধনির্ভর চিকিৎসা প্রদান করা হয়। সেখানে আচরণ পরিবর্তনের বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়। আবার কিছু কিছু চিকিৎসা কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র আছে সেখানে চিকিৎসকের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য। মাদক নির্ভরশীলদের সঠিক ও আধুনিক চিকিৎসা প্রদান করতে হলে উভয় বিষয়েই সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে এবং গুরুত্বের সঙ্গে মাদক নির্ভরশীলতার চিকিৎসায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফাইড এডিকশন কাউন্সিলর এবং হেড অব আমিক